মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)

রচনা ও সংকলন
মো. নাজমুল হোসেন
Email:naj302190@gmail.com

প্রকাশকাল: ৩০ জানুয়ারী,২০২৬

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, দয়ার সাগর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর, যাঁকে আল্লাহ তাআলা অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে সত্যের মশাল এবং 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' বা বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন।

ইতিহাসের পাতায় বহু মহাপুরুষের আগমন ঘটেছে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মতো নিখুঁত এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন আর দ্বিতীয় কারো নেই। তাঁর জীবন কেবল একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের জন্য নয়, বরং বর্ণ, ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য এক চিরন্তন আলোকবর্তিকা। যখন পৃথিবী অসভ্যতা, বর্বরতা এবং মূর্তিপূজার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন তিনি একাই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। তাঁর সেই পরিবর্তন কেবল আধ্যাত্মিক ছিল না, তা ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির পথপ্রদর্শক।

'মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)' গ্রন্থটি রচনার মূল উদ্দেশ্য হলো—নবীজি (সা.)-এর সীরাত বা জীবনচরিতকে একটি সহজবোধ্য এবং তথ্যবহুল আঙ্গিকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা। আমরা আজ এমন এক সময়ে বাস করছি যেখানে নৈতিক অবক্ষয় এবং আদর্শিক সংকট আমাদের চারপাশকে ঘিরে ধরেছে। এমতাবস্থায় আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত শান্তির পথ খুঁজে পেতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ চর্চার কোনো বিকল্প নেই।

এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় আমি চেষ্টা করেছি নবীজি (সা.)-এর জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর ওফাত পর্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরতে। তাঁর শৈশবের আমানতদারিতা, যৌবনের কর্মনিষ্ঠা, হেরা গুহার ধ্যান, নবুয়ত প্রাপ্তি, মক্কায় সীমাহীন ধৈর্য এবং মদিনায় একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়গুলো এখানে আলোচিত হয়েছে। বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে তাঁর সেই মানবিক গুণাবলী—যাতে চরম শত্রুকেও তিনি অনায়াসে ক্ষমা করে দিতেন।

আমি জানি, নবীজি (সা.)-এর সুবিশাল এবং মহিমান্বিত জীবনকে অল্প কিছু পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করা অসম্ভব। সমুদ্রকে যেমন একটি পাত্রে ধারণ করা যায় না, তাঁর জীবনও তেমনি অসীম। তবুও আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি একজন পাঠকের হৃদয়েও নবীজির প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করার প্রেরণা জোগাতে পারে, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

গ্রন্থটি সংকলনের ক্ষেত্রে আমি নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থসমূহ এবং ইতিহাসের আকর গ্রন্থগুলোর সাহায্য নিয়েছি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি থেকে গেলে আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল তা শুধরে দেওয়ার।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে প্রিয়নবী (সা.)-এর সুন্নাহ মোতাবেক জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন এবং পরকালে তাঁর শাফায়াত লাভের সৌভাগ্য দান করুন। আমিন।

বিনীত,

মো. নাজমুল হোসেন

৩০ জানুয়ারি, ২০২৬

সূচিপত্র

ক্রমিক	অধ্যায় ও শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	অধ্যায় ১: আরবের ভৌগোলিক অবস্থা ও জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগ	৬
২.	অধ্যায় ২: পবিত্র জন্ম, শৈশব এবং অলৌকিক ঘটনাবলী	৮
৩.	অধ্যায় ৩: যৌবনকাল, কর্মজীবন এবং বিবি খাদিজা (রা.)-এর সাথে বিবাহ	৯
৪.	অধ্যায় ৪: হেরা গুহায় ধ্যান ও নবুয়ত প্রাপ্তির সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত	১১
৫.	অধ্যায় ৫: গোপনে ও প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত এবং কুরাইশদের প্রথম বাধা	১২
৬.	অধ্যায় ৬: সাহাবীদের ওপর বর্বরোচিত নির্যাতন এবং আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত	১৪
৭.	অধ্যায় ৭: শেবে আবু তালিবে বন্দি জীবন এবং শোকের বছর (আমুল হুজন)	১৬
৮.	অধ্যায় ৮: ইসরা ও মিরাজ: ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ ও নামাজের উপহার	১৮
৯.	অধ্যায় ৯: মদিনায় হিজরত: এক নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি ও মদিনা সনদ	২০
১০.	অধ্যায় ১০: সত্য-মিথ্যার ফয়সালা: বদর, ওহুদ ও খন্দকের ঐতিহাসিক যুদ্ধসমূহ	২১
১১.	অধ্যায় ১১: হুদায়বিয়ার সন্ধি ও রক্তপাতহীন মক্কা বিজয়ের ইতিহাস	২৩

১২.	অধ্যায় ১২: বিদায় হজ্জ: মানবজাতির জন্য চিরকালীন মানবাধিকার সনদ	২৪
১৩.	অধ্যায় ১৩: নবীজি (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবন, পছন্দ-অপছন্দ ও খাদ্যাভ্যাস	২৬
১৪.	অধ্যায় ১৪: নবীজি (সা.)-এর নবুয়তের প্রমাণ: শ্রেষ্ঠ কিছু মুজিজা বা অলৌকিকত্ব	২৮
১৫.	অধ্যায় ১৫: ওফাত: মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে ফেরা ও উম্মতের প্রতি শেষ বার্তা	২৯
১৬.	উপসংহার: আধুনিক বিশ্বে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা	৩১

অধ্যায় ১: আরবের ভৌগোলিক অবস্থা ও জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগ

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনী আলোচনার আগে তৎকালীন আরবের পটভূমি জানা অপরিহার্য। কারণ, কোনো রত্নের মূল্য বুঝতে হলে তার চারপাশের অন্ধকারকে বুঝতে হয়।

১. আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য

আরব উপদ্বীপকে বলা হয় **'জাজিরাতুল আরব'** বা আরবের দ্বীপ। এটি এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ—এই তিন মহাদেশের মিলনস্থলে অবস্থিত। এই কৌশলগত অবস্থানটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখান থেকেই পরবর্তীতে ইসলামের বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া সহজ হয়েছিল।

- **মরুভূমি ও জলবায়ু:** আরবের অধিকাংশ ভূমিই ছিল উত্তপ্ত বালুচর আর পাথুরে পাহাড়। এখানে বৃষ্টিপাত ছিল যৎসামান্য। এই প্রতিকূল আবহাওয়া আরবদের শরীরকে করেছিল ইস্পাত-কঠিন এবং তাদের মনকে করেছিল স্বাধীনচেতা। তারা কারো দাসত্ব পছন্দ করত না।
- **বিচ্ছিন্নতা ও নিরাপত্তা:** আরবের বিশাল মরুভূমি পার হয়ে আক্রমণ করা পারস্য বা রোম সাম্রাজ্যের জন্য অসম্ভব ছিল। ফলে আরবীয় সংস্কৃতি বাইরে থেকে আসা কোনো বিকৃতির শিকার হয়নি। এটি ছিল একটি 'সুরক্ষিত দুর্গ' যেখানে আরবরা তাদের নিজস্ব ভাষা ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে পেরেছিল।

---

২. জাহেলিয়াত বা অন্ধকারের যুগ **(Age of Ignorance)**

নবীজি (সা.)-এর আগমনের পূর্বের সময়কে ইতিহাসে 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বলা হয়। 'জাহেলিয়াত' মানে শুধু অশিক্ষা নয়, বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দেউলিয়াত্ব।

(ক) ধর্মীয় অবস্থা: একত্ববাদ থেকে মূর্তিপূজা

হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ.) আরবে একত্ববাদের (তাওহীদ) যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, মানুষ তা ভুলে গিয়েছিল।

- **মূর্তিপূজা:** পবিত্র কাবা শরীফ, যা ছিল আল্লাহর ঘর, সেখানে ৩৬০টি মূর্তির পূজা করা হতো। 'হুবাল' ছিল তাদের প্রধান দেবতা। এছাড়া লাত, মানাত ও উজ্জা নামক দেবীর পূজা তারা করত।
- **অন্ধবিশ্বাস:** তারা পাথরের পূজা করত। এমনকি সফরের সময় সুন্দর পাথর না পেলে মাটির দলা বানিয়ে তার ওপর দুধ ঢেলে তার পূজা করত। এছাড়াও তারা নক্ষত্র, জিন এবং প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী ছিল।

(খ) সামাজিক অবস্থা: পাপাচার ও বৈষম্য

তৎকালীন আরবের সমাজ ছিল পুরোপুরি গোত্রভিত্তিক। মানুষের কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, পরিচয় ছিল গোত্রে।

- **কন্যা সন্তান জ্যান্ত কবর দেওয়া:** সে সময়ে কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়াকে চরম অপমানের মনে করা হতো। অনেক পাষাণ পিতা তাদের নিষ্পাপ কন্যা শিশুকে নিজ হাতে গর্ত খুঁড়ে জ্যান্ত কবর দিয়ে আসত।
- **নারীর অধিকারহীনতা:** নারীদের কোনো মানবিক অধিকার ছিল না। তারা ছিল ভোগের সামগ্রী। এক একজন পুরুষ অগুনতি বিয়ে করত এবং মৃত্যুর পর পিতার স্ত্রী বা দাসীরা উত্তরাধিকার হিসেবে ছেলেদের দখলে চলে যেত।
- **দাস প্রথা:** মানুষের কোনো সম্মান ছিল না। কেনা-বেচার হাটে পশুদের মতো দাস-দাসীদের কেনা হতো। তাদের ওপর চলত অমানুষিক নির্যাতন।

(গ) রাজনৈতিক অবস্থা: গোত্রীয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

আরবে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। প্রতিটি গোত্র ছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মতো।

- রক্তের বদলে রক্ত: 'চোখের বদলে চোখ' ছিল তাদের আইন। কোনো গোত্রের একজন সদস্য মারা গেলে অন্য গোত্রের শত শত মানুষকে হত্যা করা হতো।
- দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ: সামান্য উট দৌড় বা ঘোড়া নিয়ে তুচ্ছ বিবাদ থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধ কয়েক প্রজন্ম (৪০-৫০ বছর) ধরে চলত। 'দাহেস-গাবরা' এবং 'বাসুস'-এর যুদ্ধ এর বড় উদাহরণ।

---

৩. আরবের ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ

অবাক করার মতো বিষয় হলো, এত অন্ধকারের মাঝেও তাদের ভাষা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তারা ছিল বংশমর্যাদা এবং ভাষার অলংকারের ব্যাপারে অত্যন্ত গর্বিত।

- কবিতার শক্তি: একজন শ্রেষ্ঠ কবির কবিতা একটি গোত্রকে যেমন সম্মানের শীর্ষে নিতে পারত, তেমনি যুদ্ধের আগুনও জ্বালিয়ে দিতে পারত।
- ওকাজ মেলা: প্রতি বছর মক্কার পাশে ওকাজ নামক স্থানে মেলা বসত, যেখানে আরবের শ্রেষ্ঠ কবিরা তাদের কবিতা পাঠ করতেন। শ্রেষ্ঠ সাতটি কবিতাকে সোনার অক্ষরে লিখে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো, যা 'সাবআ মুআল্লাকাত' নামে পরিচিত।

---

৪. কেন আরব ভূমিকেই বেছে নেওয়া হলো?

অনেকে প্রশ্ন করেন, কেন আরব? উত্তরটি হলো— ১. আরবরা ছিল একদম সরল প্রকৃতির; তাদের মনে অন্য কোনো জাতির কুসংস্কার বাসা বাঁধেনি। ২. তাদের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। লক্ষ লক্ষ শব্দ এবং দীর্ঘ কবিতা তারা অনায়াসে মুখস্থ রাখতে পারত। পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের জন্য এমন এক জাতির প্রয়োজন ছিল। ৩. তাদের মেহমানদারি ও সাহসিকতা ছিল অনন্য, যা সত্যের পথে আত্মত্যাগের জন্য উপযুক্ত ছিল।

দ্বিতীয় খণ্ড: পবিত্র জন্ম ও শৈশবের অলৌকিক নিদর্শনসমূহ

১. অলৌকিক জন্ম ও সমসাময়িক নিদর্শন

৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল যখন আমিনা বিনতে ওয়াহাবের কোল উজ্জ্বল করে মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীতে আসেন, তখন আরবের আকাশ-বাতাসে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সুর বেজে ওঠে।

- পারস্যের রাজপ্রাসাদের কম্পন: তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন পারস্যের প্রতাপশালী সম্রাট কিসরার রাজপ্রাসাদের ১৪টি গম্বুজ ভেঙে পড়েছিল। এটি ছিল পৃথিবীতে অন্যায়ের ভিত্তি ভেঙে পড়ার একটি প্রতীক।
- পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নিভে যাওয়া: পারস্যের অগ্নি উপাসকরা যে অগ্নিকুণ্ডটিকে দীর্ঘ এক হাজার বছর ধরে জ্বালিয়ে রেখেছিল, নবীজির জন্মের মুহূর্তে তা কোনো কারণ ছাড়াই নিভে যায়।

- **সাওয়া হ্রদ শুকিয়ে যাওয়া:** পারস্যের একটি পবিত্র হ্রদ (সাওয়া), যার পূজা করা হতো, সেটি হঠাৎ শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়।
- **আমিনার দেখা আলো:** মা আমিনা বর্ণনা করেছেন, যখন তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, তখন তাঁর থেকে এমন এক নূরের বা আলোর বিচ্ছুরণ ঘটল, যাতে সুদূর সিরিয়ার বিশাল বিশাল প্রাসাদগুলো মক্কা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

২. বিবি হালিমার ঘরে অলৌকিক বরকত

আরবের প্রথা অনুযায়ী, বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষা এবং মরুভূমির মুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠার জন্য ছোট মুহাম্মদকে (সা.) বনী সাদ গোত্রের দাই হালিমা সাদিয়ার কাছে সোপর্দ করা হয়। হালিমার ঘর তখন ছিল চরম অভাবের।

- **দুর্বল বাহন যখন দ্রুতগামী:** দাই হালিমা মক্কায় এসেছিলেন একটি দুর্বল গাধায় চড়ে, যা সবার পেছনে থাকছিল। কিন্তু শিশু মুহাম্মদকে (সা.) কোলে নেওয়ার পর সেই গাধাটি এত দ্রুত চলতে শুরু করল যে কাফেলার সবাই অবাক হয়ে গেল।
- **শুষ্ক ওলানে দুধের ধারা:** হালিমার নিজের সন্তানের জন্য তাঁর স্তনে পর্যাপ্ত দুধ ছিল না এবং তাঁদের উটের ওলানও ছিল শুষ্ক। কিন্তু নবীজিকে স্পর্শ করার সাথে সাথে হালিমার স্তন দুধে ভরে ওঠে এবং তাঁদের ঘরের পশুগুলো প্রচুর দুধ দিতে শুরু করে।
- **ফসলের প্রাচুর্য:** যে বছরগুলো মুহাম্মদ (সা.) হালিমার ঘরে ছিলেন, সেই বছরগুলোতে বনী সাদ গোত্রের ঘাস ও ফসল এত বেশি হতো যা আগে কখনো হয়নি।

৩. বক্ষ বিদীর্ণকরণ বা **'শাক্কুস সদর'** (প্রথম অলৌকিক অস্ত্রোপচার)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বয়স যখন মাত্র চার বছর, তখন বনী সাদ গোত্রে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। তিনি তাঁর দুধভাইদের সাথে মরুভূমিতে খেলছিলেন। এমন সময় সাদা পোশাক পরা দুজন মানুষ (ফেরেশতা জিবরাঈল ও মিকাইল) তাঁর কাছে আসেন।

তাঁরা তাঁকে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বক্ষ মোবারক বিদীর্ণ করেন। সেখান থেকে তাঁর হৃৎপিণ্ড বের করে আনা হয় এবং তা থেকে শয়তানের একটি কালো রক্তের দলা ফেলে দেওয়া হয়। এরপর হৃৎপিণ্ডটি একটি স্বর্ণের তশতরিতে রাখা জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে আবার আগের জায়গায় স্থাপন করা হয়। এই ঘটনার পর তাঁর ভেতর থেকে দুনিয়াবি সকল পাপাচারের ইচ্ছা চিরতরে দূর হয়ে যায় এবং তা নূরে ভরে ওঠে।

৪. পাদ্রী বুহাইরা ও অলৌকিক মেঘের ছায়া

১২ বছর বয়সে নবীজি তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসার কাজে সিরিয়া যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে 'বুসরা' নামক স্থানে বুহাইরা নামক এক খ্রিস্টান পাদ্রীর সাথে তাঁদের দেখা হয়। বুহাইরা সেখানে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখেন:

- **মেঘের ছায়া:** প্রখর রোদে মরুভূমির বালু যখন তপ্ত, তখন একটি ছোট মেঘের টুকরো শিশু মুহাম্মদকে (সা.) মাথার ওপর ছায়া দিচ্ছিল।
- **গাছের সিজদা:** কাফেলা যখন একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নিতে বসল, তখন দেখা গেল গাছের ডালগুলো নবীজির দিকে ঝুঁকে পড়ছে তাঁকে ছায়া দেওয়ার জন্য।

পাদ্রী বুহাইরা তাঁর ইনজিল কিতাবে পড়া শেষ নবীর লক্ষণের সাথে এই বালকের হুবহু মিল খুঁজে পান এবং আবু তালিবকে সতর্ক করেন যেন তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়, কারণ ইহুদিরা তাঁর ক্ষতি করতে পারে।

৫. এতিম জীবনের কষ্ট ও আল্লাহর সুরক্ষা

নবীজি (সা.) শৈশবে একের পর এক অভিভাবককে হারান। মা আমিনা তাঁকে নিয়ে মদিনায় বাবার কবর জিয়ারত করে ফেরার পথে ইন্তেকাল করেন। ছোট্ট মুহাম্মদ (সা.) বিজন মরুভূমিতে মায়ের মৃত্যু দেখেন। এরপর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের স্নেহও বেশিদিন থাকেনি। এই ক্রমাগত স্বজন হারানোর মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাঁকে শেখাচ্ছিলেন যে, তাঁর প্রকৃত অভিভাবক একমাত্র আল্লাহ।

শৈশবে তিনি মক্কার পাহাড়ে ছাগল চরাতেন। তিনি পরে বলতেন, "আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চরাননি।" এটি তাঁকে ধৈর্য এবং নেতৃত্ব দেওয়ার প্রাথমিক শিক্ষা দিয়েছিল।

অধ্যায় ৩: যৌবনকাল, ব্যবসা এবং খাদিজা (রা.)-এর সাথে বিবাহ

শৈশবের অলৌকিক ছায়া কাটিয়ে মুহাম্মদ (সা.) যখন কৈশোর ও যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন এক গাম্ভীর্য ও মাধুর্য ফুটে ওঠে যা মক্কার অন্য কোনো যুবকের মধ্যে ছিল না।

১. যৌবনের পবিত্রতা ও 'হিলফুল ফুজুল'

তৎকালীন আরবের যুবকরা যখন মদ, জুয়া আর নাচ-গানে মত্ত থাকত, মুহাম্মদ (সা.) তখন আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

- ফিজার যুদ্ধ ও তাঁর ভূমিকা: আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী 'ফিজার যুদ্ধ' দেখে তিনি ব্যথিত হন। রক্তপাত বন্ধে তিনি তাঁর চাচাদের সাথে পরামর্শ করে 'হিলফুল ফুজুল' বা 'শান্তি সংঘ' গঠন করেন। এই সংগঠনের অঙ্গীকার ছিল— অত্যাচারিতকে সাহায্য করা এবং মক্কায় শান্তি বজায় রাখা।
- আল-আমিন উপাধি: তাঁর সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতা মক্কায় প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। মানুষ তাদের মূল্যবান সম্পদ কোনো দ্বিধা ছাড়াই তাঁর কাছে জমা রাখত। এই অসাধারণ চরিত্রের কারণেই মক্কাবাসী তাঁকে 'আল-আমিন' (পরম বিশ্বস্ত) এবং 'আস-সাদিক' (সত্যবাদী) উপাধিতে ভূষিত করে।

২. ব্যবসা ও কর্মজীবন

সে সময়ে আরবের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল ব্যবসা। মুহাম্মদ (সা.) তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসার কাজে সিরিয়া সফর করে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

- সততার দৃষ্টান্ত: তিনি যখন স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করেন, তখন ওজনে কম দেওয়া বা পণ্যের দোষ গোপন করার মতো তৎকালীন প্রচলিত অভ্যাসগুলো তিনি কঠোরভাবে বর্জন করেন। তিনি বলতেন, "সত্যবাদী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী ও শহীদদের সাথে থাকবে।"
- সিরিয়া সফর ও প্রজ্ঞা: তাঁর চমৎকার বাচনভঙ্গি এবং হিসাব নিকাশের স্বচ্ছতা অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

৩. খাদিজা (রা.)-এর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক

মক্কার ধনাঢ্য ও মহীয়সী নারী খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ ছিলেন একজন অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর ব্যবসার জন্য একজন বিশ্বস্ত মানুষের খোঁজ করছিলেন। মুহাম্মদ (সা.)-এর সুখ্যাতি শুনে তিনি তাঁকে প্রস্তাব দেন তাঁর মালপত্র নিয়ে সিরিয়া যাওয়ার জন্য।

- মাইসারার পর্যবেক্ষণ: খাদিজা (রা.) তাঁর বিশ্বস্ত দাস মাইসারাকে নবীজির সাথে পাঠিয়েছিলেন। সিরিয়া সফর শেষে মাইসারা ফিরে এসে নবীজির অলৌকিক গুণাবলী বর্ণনা করেন। তিনি জানান যে, সফরের সময় প্রখর রোদে একখণ্ড মেঘ নবীজিকে ছায়া দিত এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ছিল অত্যন্ত বরকতময় ও নিখুঁত।
- বিস্ময়কর লাভ: মুহাম্মদ (সা.)-এর সততা ও দূরদর্শিতার কারণে সেই সফরে খাদিজা (রা.) ইতিপূর্বেকার সকল সফরের চেয়ে দ্বিগুণ লাভ করেন।

৪. বিবাহের প্রস্তাব ও ঐতিহাসিক বন্ধন

খাদিজা (রা.) মুহাম্মদ (সা.)-এর চারিত্রিক মাধুর্য ও অলৌকিক নিদর্শনে মুগ্ধ হয়ে নিজে থেকেই বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর বান্ধবী নাফিসার মাধ্যমে এই প্রস্তাব পাঠান।

- বিবাহের আসর: তখন মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর (মতান্তরে ২৮)। বিয়ের খুতবা পাঠ করেন চাচা আবু তালিব। দেনমোহর হিসেবে দেওয়া হয়েছিল ২০টি উট।
- দাম্পত্য জীবনের আদর্শ: এই বিয়ে ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম দাম্পত্য। খাদিজা (রা.) তাঁর সমস্ত সম্পদ নবীজির চরণে উৎসর্গ করেন। পরবর্তী ২৫ বছর খাদিজা (রা.) বেঁচে থাকা পর্যন্ত নবীজি আর কোনো বিয়ে করেননি। খাদিজা (রা.) ছিলেন নবীজির সবচেয়ে বড় মানসিক শক্তি ও অনুপ্রেরণা।

৫. হাজরে আসওয়াদ স্থাপন ও প্রজ্ঞার পরিচয়

নবীজির বয়স যখন ৩৫ বছর, তখন প্রবল বন্যায় কাবা ঘরের প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাবার সংস্কার শেষে পবিত্র 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর স্থাপন নিয়ে মক্কার গোত্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধের উপক্রম হয়। প্রতিটি গোত্রই এই সম্মানের ভাগীদার হতে চাচ্ছিল।

- নবীজির সমাধান: মুহাম্মদ (সা.) একটি চাদর বিছিয়ে তার ওপর পাথরটি রাখলেন এবং প্রতিটি গোত্রের প্রধানকে চাদরের এক একটি কোণা ধরতে বললেন। সবাই মিলে পাথরটি যথাস্থানে নিয়ে গেলে নবীজি নিজ হাতে সেটি স্থাপন করলেন। তাঁর এই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় মক্কা একটি বিশাল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে রক্ষা পায়।

অধ্যায় ৪: হেরা গুহায় নবুয়ত প্রাপ্তি ও প্রথম ওহী

মুহাম্মদ (সা.) যখন চল্লিশ বছরে পদার্পণ করেন, তখন তাঁর অন্তরে এক গভীর নির্জনতাপ্রিয়তা জন্ম নেয়। মক্কার মূর্তিপূজা, সামাজিক অন্যায় আর নৈতিক অবক্ষয় তাঁর মনকে ব্যথিত করত। তিনি সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

১. নির্জনতা ও হেরা গুহায় ধ্যান

মক্কা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত 'জাবালে নূর' বা আলোর পাহাড়। এই পাহাড়ের চূড়ায় একটি ছোট গুহা ছিল, যার নাম 'হেরা'।

- ধ্যানের স্বরূপ: তিনি মাসের পর মাস এই গুহায় কাটাতেন। সাথে নিয়ে যেতেন সামান্য ছাতু আর পানি। সেখানে তিনি মহাবিশ্বের স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করতেন এবং ইব্রাহিম (আ.)-এর আদি ধর্মের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর ইবাদত করতেন।
- স্বপ্নের সত্যতা: নবুয়ত পাওয়ার প্রায় ছয় মাস আগে থেকে তিনি যা স্বপ্নে দেখতেন, তা দিনের আলোর মতো ফলে যেত। একে বলা হয় 'আস-সালিহাহ' বা সত্য স্বপ্ন। এটি ছিল নবুয়তের একটি প্রাথমিক আলামত।

২. জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন ও প্রথম ওহী

৬১০ খ্রিস্টাব্দ, রমজান মাসের একটি শান্ত রাত (যা পরবর্তীকালে লাইলাতুল কদর হিসেবে পরিচিত হয়)। হঠাৎ হেরা গুহার অন্ধকার আলোকিত করে এক স্বর্গীয় সত্তা হাজির হলেন। তিনি ছিলেন ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.)।

- **"ইকরা" (পড়ুন):** জিবরাঈল (আ.) তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "পড়ুন"। মুহাম্মদ (সা.) উত্তর দিলেন, "আমি তো পড়তে জানি না।" (মা আনা বি-ক্বারি)।
- **আলিঙ্গনের রহস্য:** ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) তাঁকে তিনবার সজোরে বুকে চেপে ধরলেন। তৃতীয়বার আলিঙ্গনের পর মুহাম্মদ (সা.)-এর হৃদয়ে ওহী বা আল্লাহর বাণী গেঁথে গেল।
- **প্রথম পাঁচটি আয়াত:** জিবরাঈল (আ.) উচ্চারণ করলেন পবিত্র কুরআনের প্রথম বাণী:
  "পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" (সূরা আলাক: ১-৫)

৩. আতঙ্ক ও খাদিজি (রা.)-এর ভূমিকা

এই অলৌকিক ও অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতায় মুহাম্মদ (সা.) ভীষণ ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁর শরীর কাঁপছিল। তিনি দ্রুত বাড়ি ফিরে বিবি খাদিজা (রা.)-কে বললেন, **"যাম্মিলুনী, যাম্মিলুনী"** (আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও)।

- **বিশ্বস্ত স্ত্রীর সান্ত্বনা:** খাদিজা (রা.) তাঁকে যে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, তা ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণাদায়ী কথা। তিনি বলেছিলেন:
  "কখনো নয়! আল্লাহর কসম, তিনি আপনাকে কখনো অপদস্থ করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায়দের ভার বহন করেন, নিঃস্বদের জন্য উপার্জনের ব্যবস্থা করেন, মেহমানদারি করেন এবং সত্যের পথে আপদ-বিপদে মানুষকে সাহায্য করেন।"

৪. ওয়ারাকা বিন নাওফলের সাক্ষ্য

খাদিজা (রা.) তাঁকে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফলের কাছে গেলেন, যিনি ইঞ্জিল ও তাওরাত কিতাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। মুহাম্মদ (সা.)-এর বর্ণনা শুনে ওয়ারাকা বললেন:

- "ইনি সেই **'নামুস'** (জিবরাঈল), যিনি মুসা (আ.)-এর কাছে আসতেন।"
- ওয়ারাকা আরও ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে, একদিন মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর কওম বা দেশবাসী বের করে দেবে। নবীজি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কি আমাকে বের করে দেবে?" ওয়ারাকা বললেন, "হ্যাঁ, আপনার মতো সত্য বাণী নিয়ে যিনিই এসেছেন, তাঁর সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে।"

৫. নবুয়তের গুরুত্ব ও প্রভাব

এই ঘটনার মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বনবী হিসেবে অভিষিক্ত হলেন। জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত এই প্রথম ওহী ছিল মানবজাতির প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় উপহার। এখান থেকেই ২৩ বছরের এক দীর্ঘ পরিক্রমা শুরু হলো, যার প্রতিটি ধাপে কুরআন নাজিল হতে থাকল।

আমরা আমাদের সীরাত প্রকল্পের পঞ্চম অধ্যায়ে পদার্পণ করছি। এই অধ্যায়টি ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম সংঘাতময় এবং ধৈর্যের চূড়ান্ত পরীক্ষার সময়। এখানে আমরা দেখব কীভাবে একটি নীরব বিপ্লব মক্কার অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়ল এবং কীভাবে কাফেরদের পাহাড়সম বাধা চূর্ণ করে সত্যের আলো প্রজ্বলিত রইল।

অধ্যায় ৫: গোপনে ও প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত এবং কুরাইশদের বাধা

নবুয়ত প্রাপ্তির পর মহানবী (সা.)-এর ওপর এক বিশাল দায়িত্ব অর্পিত হয়। কিন্তু মক্কার সমাজ ছিল মূর্তিপূজা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাই আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর মিশন শুরু করেন।

১. গোপন দাওয়াত (তিন বছরের নীরব বিপ্লব)

নবুয়তের শুরুর তিন বছর রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু তাঁর নিকটাত্মীয় এবং বিশ্বস্ত বন্ধুদের কাছে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দেন। একে বলা হয় 'দাওয়াতুস সিররান'।

- প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীগণ: নবীজি (সা.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর সহধর্মিণী হযরত খাদিজা (রা.)। এরপর পুরুষদের মধ্যে তাঁর বাল্যবন্ধু হযরত আবু বকর (রা.), বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) এবং মুক্ত দাসের মধ্যে হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা.) ইসলাম কবুল করেন।
- আবু বকর (রা.)-এর ভূমিকা: আবু বকর (রা.) ছিলেন আরবের একজন প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁর দাওয়াতে উসমান ইবনে আফফান, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ এবং যুবায়ের ইবনুল আওয়ামের মতো প্রভাবশালী সাহাবীরা ইসলামে দীক্ষিত হন।
- দারুল আরকাম: মক্কার সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আরকাম ইবনে আবিল আরকামের বাড়িটিকে ইসলামের প্রথম গোপন শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সেখানে নবীজি (সা.) নতুন মুসলিমদের কুরআন শেখাতেন এবং ইবাদত পরিচালনা করতেন।

২. প্রকাশ্যে দাওয়াত ও সাফা পাহাড়ের ঘোষণা

তিন বছর পর আল্লাহ তাআলা আদেশ দিলেন— "আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন" (সূরা শুয়ারা: ২১৪) এবং "আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন" (সূরা হিজর: ৯৪)।

- সাফা পাহাড়ের সেই দিন: নবীজি (সা.) সাফা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে মক্কার সব গোত্রকে ডাকলেন। সবাই জড়ো হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, *"আমি যদি বলি এই পাহাড়ের ওপাশে একদল শত্রু সৈন্য আপনাদের আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করছে, তবে কি আপনারা বিশ্বাস করবেন?"* সবাই একবাক্যে বলল— *"হ্যাঁ, কারণ আমরা আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি।"*
- চরম শত্রুতা: তখন নবীজি (সা.) বললেন— *"তবে শুনে রাখুন, আমি আপনাদের এক কঠিন শাস্তির (জাহান্নামের) ভয় দেখাচ্ছি। আপনারা এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনুন।"* এটি শুনে তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব অভিশাপ দিয়ে বলল— *"তোমার ধ্বংস হোক! একি জন্য আমাদের ডেকেছ?"* সেখান থেকেই শুরু হলো প্রকাশ্য শত্রুতার অধ্যায়।

৩. কুরাইশদের বাধার ধরণ ও নির্যাতন

ইসলামের বাণী যখন মক্কার ঘরে ঘরে পৌঁছাতে শুরু করল, তখন কুরাইশ নেতারা প্রমাদ গুনলেন। তারা বুঝতে পারলেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের ব্যবসা, নেতৃত্ব এবং মূর্তিপূজার আভিজাত্য সব শেষ হয়ে যাবে।

তারা তিনটি স্তরে বাধা দিতে শুরু করল:

1. **অপপ্রচার ও বিদ্রূপ:** তারা নবীজিকে 'জাদুকর', 'পাগল' বা 'ভণ্ড কবি' বলে প্রচার করতে লাগল। হজ্জের মৌসুমে মক্কার প্রবেশপথে লোক বসিয়ে দেওয়া হতো যেন কেউ নবীজির কথা না শোনে।
2. **প্রলোভন:** তারা নবীজির কাছে প্রস্তাব পাঠাল— "তুমি যদি সম্পদ চাও তবে আমরা তোমাকে আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী বানিয়ে দেব, যদি নেতৃত্ব চাও তবে তোমাকে রাজা বানাব, আর যদি নারী চাও তবে আরবের সুন্দরী নারীদের সাথে বিয়ে দেব; বিনিময়ে তুমি শুধু আমাদের মূর্তিদের গালি দেওয়া বন্ধ করো।" নবীজি উত্তর দিয়েছিলেন— "আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদ এনে দিলেও আমি এই মিশন থেকে এক চুলও নড়ব না।"
3. **শারীরিক নির্যাতন:** যখন প্রলোভনে কাজ হলো না, তখন শুরু হলো অমানুষিক নির্যাতন।

   বিলাল (রা.)-এর ধৈর্য: ক্রীতদাস বিলাল (রা.)-কে তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে বুকে ভারি পাথর চাপা দেওয়া হতো। তাঁর জবান থেকে তখনো বের হতো— **"আহাদ, আহাদ"** (আল্লাহ এক)। **খাব্বাব (রা.):** তাঁকে জ্বলন্ত কয়লার ওপর শুইয়ে দেওয়া হতো যতক্ষণ না তাঁর পিঠের চর্বি গলে আগুন নিভে যেত। **সুমাইয়া (রা.):** ইসলামের প্রথম শহীদ। আবু জাহলের বর্শার আঘাতে তিনি প্রাণ দেন, কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করেননি।

৪. আবু তালিবের ওপর চাপ

কুরাইশরা বারবার নবীজির চাচা আবু তালিবের কাছে গিয়ে দাবি জানাল যেন তিনি তাঁর ভাতিজাকে থামান। কিন্তু আবু তালিব আমৃত্যু নবীজিকে রক্ষা করেছেন। আবু তালিবের মাধ্যমে কুরাইশরা সামাজিক বয়কটের ভয় দেখালেও নবীজি ছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল।

৫. দাওয়াতের প্রভাব ও ইসলামের বিস্তার

এত নির্যাতন সত্ত্বেও ইসলামের আলো নেভানো যায়নি। বরং মক্কার তরুণ সমাজ এবং মজলুম মানুষগুলো দেখল যে, ইসলামে কোনো ভেদাভেদ নেই; রাজা আর গোলাম একই কাতারে দাঁড়ায়। ইসলামের এই মানবিক সৌন্দর্যই কুরাইশদের সমস্ত অহংকারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে শুরু করল।

অধ্যায় ৬: সাহাবীদের ওপর নির্যাতন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরত

কুরাইশরা যখন দেখল যে গালিগালাজ, বিদ্রূপ বা প্রলোভন দিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর পথ থেকে সরানো যাচ্ছে না, তখন তারা তাদের রণকৌশল পরিবর্তন করল। তারা স্থির করল যে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের ওপর এমন অমানুষিক নির্যাতন চালানো হবে যেন তারা ভয়ে ধর্ম ত্যাগ করে।

১. নির্যাতনের বিভীষিকা ও সাহাবীদের আত্মত্যাগ

মক্কার প্রতিটি গোত্র তাদের নিজেদের লোকদের ওপর নির্যাতনে মেতে উঠল। বিশেষ করে যারা দুর্বল, এতিম বা ক্রীতদাস ছিল, তাদের ওপর নেমে এল অবর্ণনীয় দুর্ভোগ।

- **হযরত বিলাল (রা.):** উমাইয়া ইবনে খালাফ ছিল বিলালের মালিক। সে দুপুরের প্রখর রোদে বিলালকে উত্তপ্ত মরুভূমির বালুর ওপর শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের ওপর বিশাল ভারি পাথর চাপা দিত। বিলালের চামড়া পুড়ে

যেত, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত, কিন্তু তাঁর জবান থেকে শুধু একটি ধ্বনিই বের হতো— "আহাদ, আহাদ" (আল্লাহ এক)।

- ইয়াসির পরিবার: হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে মক্কার উপকণ্ঠে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড রোদে প্রহার করা হতো। আবু জাহল অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে আম্মারের মা হযরত সুমাইয়া (রা.)-কে বর্শা দিয়ে আঘাত করে শহীদ করে। তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ। কিছুক্ষণ পর তাঁর স্বামী ইয়াসিরও নির্যাতনের মুখে শাহাদাত বরণ করেন।
- হযরত খাব্বাব (রা.): খাব্বাব বিন আরতকে উত্তপ্ত জ্বলন্ত কয়লার ওপর শুইয়ে রাখা হতো। তাঁর পিঠের চর্বি গলে আগুন নিভে যেত, তবুও তিনি ঈমান ত্যাগ করেননি।
- হযরত উসমান (রা.): প্রভাবশালী বংশের হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চাচা তাঁকে খেজুরের চাটাই দিয়ে মুড়িয়ে নাকে ধোঁয়া দিতেন যেন তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

নবীজি (সা.) তাঁর সাহাবীদের এই কষ্ট দেখে ব্যথিত হতেন, কিন্তু তখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের অনুমতি আসেনি। তিনি তাঁদের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিতেন।

---

২. আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত (৬১৫ খ্রিস্টাব্দ)

সাহাবীদের ওপর নির্যাতন যখন সহ্যসীমার বাইরে চলে গেল, তখন নবীজি (সা.) তাঁদের নিরাপত্তার জন্য এক অভিনব পথ দেখালেন। তিনি বললেন:

> *"তোমরা যদি আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া) চলে যেতে, তবে ভালো হতো। সেখানকার রাজা (নাজাশী) অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ; তাঁর রাজ্যে কেউ নির্যাতিত হয় না।"*

- যাত্রার শুরু: নবুয়তের ৫ম বছরে ১২ জন পুরুষ এবং ৪ জন নারী নিয়ে প্রথম কাফেলাটি মক্কা ত্যাগ করে। তাঁদের মধ্যে হযরত উসমান (রা.) এবং নবী-কন্যা রুকাইয়া (রা.)-ও ছিলেন। এটিই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম হিজরত।
- অলৌকিক নিরাপত্তা: কুরাইশরা তাঁদের পিছু নিলেও সমুদ্রতীর পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই তাঁরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। আবিসিনিয়ার রাজা নাজাশী তাঁদের সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁরা সেখানে শান্তিতে ইবাদত করতে শুরু করেন।

৩. দ্বিতীয় হিজরত ও নাজাশীর দরবার

প্রথম হিজরতের খবর পেয়ে মক্কায় আরও মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যাওয়ায় দ্বিতীয়বার প্রায় ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন নারী আবিসিনিয়ায় পাড়ি জমান। কাফেলার নেতৃত্বে ছিলেন নবীজির চাচাতো ভাই হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.)।

৪. কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ও জাফর (রা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

মুসলিমরা শান্তিতে আছে শুনে কুরাইশরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ল। তারা আমর ইবনুল আসকে (যিনি তখনো মুসলিম হননি) দামি উপহারসহ নাজাশীর দরবারে পাঠাল যেন তিনি মুসলিমদের মক্কায় ফিরিয়ে দেন। নাজাশী ছিলেন বিজ্ঞ রাজা; তিনি সরাসরি মুসলিমদের ডেকে তাঁদের বক্তব্য শুনতে চাইলেন।

নাজাশীর দরবারে দাঁড়িয়ে জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.) যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তিনি বলেছিলেন:

> "হে সম্রাট! আমরা ছিলাম এক জাহেল বা মূর্খ জাতি। আমরা মূর্তিপূজা করতাম, মৃত প্রাণীর মাংস খেতাম, প্রতিবেশীর ওপর জুলুম করতাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে একজনকে নবী করে পাঠালেন। তিনি আমাদের শেখালেন মিথ্যা না বলতে, আমানত রক্ষা করতে এবং এক আল্লাহর ইবাদত করতে। এই অপরাধেই আমাদের দেশবাসী আমাদের ওপর জুলুম করেছে।"

নাজাশী যখন কুরআনের কিছু অংশ শুনতে চাইলেন, জাফর (রা.) সূরা মারইয়াম পাঠ করে শোনালেন। যীশু (ঈসা আ.) এবং তাঁর মা মারইয়ামের পবিত্রতার বর্ণনা শুনে নাজাশী এবং তাঁর দরবারের পাদ্রীরা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। নাজাশী ঘোষণা করলেন— "তোমাদের ধর্ম এবং আমাদের ধর্ম একই উৎস থেকে আসা। তোমরা আমার রাজ্যে নিরাপদে থাকো।"

৫. এই হিজরতের গুরুত্ব

আবিসিনিয়ার হিজরত ছিল ইসলামের জন্য একটি কৌশলগত বিজয়। ১. এর মাধ্যমে প্রমাণ হলো যে ইসলাম কোনো আঞ্চলিক ধর্ম নয়, বরং এটি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য। ২. মুসলিমরা একটি নিরাপদ ঘাঁটি খুঁজে পেল। ৩. কুরাইশদের কূটনৈতিক পরাজয় ঘটল।

অধ্যায় ৭: শেবে আবু তালিবে বন্দি জীবন ও দুঃখের বছর

আবিসিনিয়ায় মুসলিমদের নিরাপদ আশ্রয় এবং মক্কায় হযরত হামজা (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর মতো বীরদের ইসলাম গ্রহণ কুরাইশদের ভীত করে তুলেছিল। তারা দেখল যে বলপ্রয়োগ করে ইসলামকে দমানো যাচ্ছে না। তাই তারা এক নিষ্ঠুর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের পরিকল্পনা করল।

১. শেবে আবু তালিবে অবরুদ্ধ জীবন (নবুয়তের ৭ম-১০ম বছর)

কুরাইশরা একটি চুক্তিপত্র লিখে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দিল। চুক্তির শর্ত ছিল— বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব গোত্রের সাথে কেউ কোনো লেনদেন করবে না, তাদের কাছে খাবার বিক্রি করবে না এবং তাদের সাথে আত্মীয়তা করবে না।

- **গিরিপথে বন্দি:** নিরুপায় হয়ে আবু তালিব তাঁর গোত্রের মুসলিম ও অমুসলিম সবাইকে নিয়ে মক্কার উপকণ্ঠে 'শেবে আবু তালিব' নামক একটি পাহাড়ের সংকীর্ণ গিরিপথে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। সেখানে তারা টানা তিন বছর অবরুদ্ধ ছিলেন।
- **খাদ্যাভাব ও করুণ দশা:** মক্কার বাইরে থেকে কোনো শস্যের কাফেলা এলে কুরাইশরা দ্বিগুণ দাম দিয়ে তা কিনে নিত যাতে মুসলিমদের হাতে কিছু না পৌঁছায়। ক্ষুধার জ্বালায় সাহাবীরা এবং কচি শিশুরা চিৎকার করত। নবীজি (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা গাছের পাতা এবং শুকনো চামড়া সিদ্ধ করে খেয়ে দিন কাটিয়েছেন। দীর্ঘ অনাহারে সবার শরীর কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল।

২. বয়কট অবসান ও অলৌকিক ঘটনা

দীর্ঘ তিন বছর পর মক্কার কিছু দয়ালু মানুষের মনে দয়ার উদ্রেক হয়। তারা এই অন্যায় চুক্তি ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে আল্লাহ তাআলা নবীজিকে ওহীর মাধ্যমে জানালেন যে, কাবার দেয়ালে ঝুলানো সেই চুক্তিপত্রটি উইপোকা খেয়ে ফেলেছে, শুধু 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' (আল্লাহর নামে) অংশটি বাকি আছে।

আবু তালিব কুরাইশদের কাছে গিয়ে বললেন, "আমার ভাতিজা বলেছে তোমাদের চুক্তি উইপোকা খেয়ে ফেলেছে। যদি এটি সত্য হয় তবে তোমরা বয়কট তুলে নাও।" তারা গিয়ে দেখল ঠিক তাই ঘটেছে। এভাবে নবুয়তের ১০ম বছরে তিন বছরের কারাবাস শেষ হলো।

---

৩. আমুল হুজন বা 'দুঃখের বছর'

কারাগার থেকে মুক্তির আনন্দ খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। নবুয়তের ১০ম বছরে অত্যন্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে নবীজি (সা.) তাঁর জীবনের প্রধান দুটি স্তম্ভকে হারান।

- **আবু তালিবের মৃত্যু:** আবু তালিব ছিলেন নবীজির ঢাল। তাঁর কারণে কুরাইশরা নবীজির গায়ে হাত তোলার সাহস পেত না। তাঁর মৃত্যুতে নবীজি অত্যন্ত ব্যথিত হন।
- **হযরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যু:** আবু তালিবের মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পর নবীজির পরম সুহৃদ, তাঁর দুঃখের সাথী এবং ইসলামের প্রথম নারী হযরত খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করেন।

নবীজি (সা.) একা হয়ে পড়লেন। বাইরে থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো কেউ থাকল না, আর ঘরের ভেতর সান্ত্বনা দেওয়ার মতো প্রিয়তমা স্ত্রী থাকলেন না। এই চরম শোকের বছরটিকে ইতিহাসে **'আমুল হুজন'** বা **'দুঃখের বছর'** বলা হয়।

৪. তায়েফ সফর: ধৈর্যের চরম পরীক্ষা

মক্কায় আশ্রয়হীন হয়ে নবীজি (সা.) ইসলাম প্রচারের জন্য তায়েফ নগরীতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ভেবেছিলেন তায়েফবাসীরা হয়তো তাঁকে সাহায্য করবে। কিন্তু ফল হলো উল্টো।

- **নিষ্ঠুর আচরণ:** তায়েফের সর্দাররা তাঁকে উপহাস করল এবং শহরের বখাটে ছেলেদের লেলিয়ে দিল। তারা নবীজিকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে লাগল। পাথরের আঘাতে তাঁর পবিত্র শরীর রক্তাক্ত হলো এবং জুতো রক্তে জমে আটকে গেল।
- **পাহাড়ের ফেরেশতার আগমন:** নবীজি যখন ব্যথায় ক্লান্ত হয়ে একটি আঙুর বাগানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) এসে বললেন, "আপনি আদেশ দিলে আমি দুই পাশের পাহাড় চাপা দিয়ে এই শহর ধ্বংস করে দেব।" কিন্তু রহমতের নবী বললেন— *"না, আমি আশা করি তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন মানুষ আসবে যারা আল্লাহর ইবাদত করবে।"*

৫. এই অধ্যায়ের শিক্ষা

এই দুঃসহ সময়গুলো প্রমাণ করে যে, সত্যের পথ কখনো পুষ্পশয্যা নয়। শেবে আবু তালিবে অনাহার এবং তায়েফে রক্তদান—এই ত্যাগগুলোই ছিল পরবর্তীতে মদিনার বিশাল বিজয়ের ভিত্তি। আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে অনেক বড় কিছু দিতে চান, তখন তাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পার করেন।

অধ্যায় ৮: ইসরা ও মিরাজ (ঊর্ধ্বাকাশে মহাভ্রমণ)

নবুয়তের একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষে (৬২১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ) এক শান্ত রাতে এই ঐতিহাসিক সফরটি সংঘটিত হয়। এটি কোনো স্বপ্ন ছিল না, বরং সশরীরে এক অলৌকিক যাত্রা ছিল।

১. ইসরা: মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস

নবীজি (সা.) কাবার হাতিমে ঘুমে ছিলেন, এমন সময় ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) এসে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে নূরে ভরে দেন। এরপর তাঁর সামনে আনা হয় **'বুরাক'** নামক একটি জান্নাতি বাহন।

- **ভ্রমণের গতি:** বুরাক ছিল বিজলির মতো দ্রুতগামী। এটি যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেখানে পা ফেলে। নবীজি বুরাকে চড়ে মক্কা থেকে ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে অবস্থিত মসজিদুল আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছান।
- **নবীদের ইমামতি:** সেখানে নবীজি (সা.) সকল নবী-রাসূলদের ইমামতি করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে তিনি **'ইমামুল মুরসালিন'** বা সকল নবীর নেতা।

---

২. মিরাজ: আসমানের সাত স্তর অতিক্রম

বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে একটি অলৌকিক সিঁড়ির মাধ্যমে জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে তিনি ঊর্ধ্বাকাশে যাত্রা শুরু করেন। প্রতিটি আসমানে তিনি পূর্ববর্তী নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন:

- **প্রথম আসমান:** হযরত আদম (আ.)।
- **দ্বিতীয় আসমান:** হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ.)।
- **তৃতীয় আসমান:** হযরত ইউসুফ (আ.)।
- **চতুর্থ আসমান:** হযরত ইদ্রিস (আ.)।
- **পঞ্চম আসমান:** হযরত হারুন (আ.)।
- **ষষ্ঠ আসমান:** হযরত মুসা (আ.)।
- **সপ্তম আসমান:** হযরত ইব্রাহিম (আ.)। তিনি সেখানে বায়তুল মামুর (ফেরেশতাদের কাবা) এর সাথে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন।

৩. সিদরাতুল মুনতাহা ও আল্লাহর সান্নিধ্য

সপ্তম আসমান পার হওয়ার পর নবীজি পৌঁছে যান **'সিদরাতুল মুনতাহা'** বা প্রান্তীয় কুলবৃক্ষের কাছে। এটি সৃষ্টির জ্ঞানের শেষ সীমানা।

- **জিবরাঈল (আ.)-এর থমকে যাওয়া:** সিদরাতুল মুনতাহার পর জিবরাঈল (আ.) আর এগোতে পারলেন না। তিনি বললেন, "এখান থেকে আর এক চুল পরিমাণ এগোলে আমি আল্লাহর নূরে পুড়ে ছাই হয়ে যাব।"
- **দিদারে এলাহি:** এরপর নবীজি (সা.) একা অগ্রসর হন এবং আল্লাহর আরশের সন্নিকটে পৌঁছান। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবিবকে একান্ত সান্নিধ্য দান করেন এবং পর্দা ছাড়াই তাঁর সাথে কথোপকথন করেন।

---

৪. উম্মতের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার: নামাজ

মিরাজের এই সফরে আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বড় উপহার হিসেবে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন। ফেরার পথে হযরত মুসা (আ.)-এর পরামর্শে নবীজি কয়েকবার আল্লাহর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেন এবং প্রতিবার আল্লাহ কিছু ওয়াক্ত কমিয়ে দেন।

- **পাঁচ ওয়াক্তের ফজিলত:** অবশেষে এটি পাঁচ ওয়াক্তে এসে পৌঁছায়। আল্লাহ ঘোষণা করেন, "ওয়াক্ত পাঁচই থাকবে, কিন্তু সওয়াব দেওয়া হবে পঞ্চাশ ওয়াক্তের।"

৫. জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন

এই ভ্রমণে নবীজি (সা.)-কে জান্নাতের নাজ-নেয়ামত এবং জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি দেখানো হয়। তিনি দেখেন কীভাবে মানুষের গিবত বা পরনিন্দার কারণে তাদের নখ দিয়ে নিজেদের মুখ ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে এবং এতিমের মাল ভক্ষণকারীদের ভয়াবহ দণ্ড দেওয়া হচ্ছে। এই দর্শনগুলো ছিল উম্মতকে সতর্ক করার জন্য এক বিশেষ শিক্ষা।

৬. মক্কায় প্রত্যাবর্তন ও পরীক্ষার সম্মুখীন

সকাল হওয়ার আগে নবীজি (সা.) মক্কায় ফিরে আসেন। সকালে যখন তিনি কুরাইশদের এই ভ্রমণের কথা বললেন, তারা তাঁকে উপহাস করতে শুরু করল। তারা ভাবল, যে পথ যেতে এক মাস লাগে, মুহাম্মদ কীভাবে তা এক রাতে ঘুরে এল?

- **সিদ্দিকে আকবর:** যখন কাফেররা হযরত আবু বকর (রা.)-কে এই কথা জানাল, তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বললেন, *"মুহাম্মদ (সা.) যদি বলে থাকেন, তবে তা শতভাগ সত্য।"* এই দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে সেদিন তিনি **'সিদ্দিক'** উপাধি পান।
- **বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রমাণ:** কাফেররা নবীজিকে পরীক্ষা করার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসের কয়টি দরজা বা জানালা আছে তা জিজ্ঞেস করল। আল্লাহ অলৌকিকভাবে নবীজির চোখের সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসকে হাজির করলেন এবং তিনি দেখে দেখে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। কাফেররা হতবাক হয়ে গেল।

৭. মিরাজের তাৎপর্য

মিরাজ ছিল নবীজির জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান। এটি প্রমাণ করে যে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিজয়ী জীবনবিধান এবং নামাজ হলো মুমিনের জন্য শ্রেষ্ঠ উপাসনা। মিরাজের মাধ্যমেই নবীজিকে মদিনায় হিজরতের পরবর্তী বড় মিশনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল।

অধ্যায় ৯: মদিনায় হিজরত ও নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি

মক্কার কুরাইশরা যখন দেখল যে নবীজির মিশন মদিনায় ছড়িয়ে পড়ছে, তখন তারা শেষবারের মতো তাঁকে হত্যার চূড়ান্ত পরিকল্পনা করল। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম।

১. হত্যার ষড়যন্ত্র ও অলৌকিক পলায়ন

কুরাইশরা **'দারুন নদওয়া'** নামক পরামর্শ সভায় মিলিত হলো। শয়তান মানুষের বেশে সেখানে এসে পরামর্শ দিল—প্রতিটি গোত্র থেকে একজন করে যুবক তলোয়ার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-কে একসাথে আঘাত করবে, যাতে কোনো নির্দিষ্ট গোত্রকে দায়ী করা না যায়।

- হযরত আলীর (রা.) ত্যাগ: নবীজি আল্লাহর নির্দেশে হিজরতের প্রস্তুতি নিলেন। তিনি তাঁর বিছানায় হযরত আলীকে শুইয়ে দিলেন এবং কুরাইশদের আমানত করা সম্পদগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন।
- দৃষ্টির আড়াল: ঘাতকরা যখন ঘর ঘেরাও করে ছিল, নবীজি সূরা ইয়াসিনের আয়াত পাঠ করে এক মুঠো ধুলো তাদের দিকে ছুড়ে দিলেন। আল্লাহর কুদরতে তারা অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল আর নবীজি তাদের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

২. সাওর গুহায় তিন দিন

নবীজি (সা.) এবং তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত আবু বকর (রা.) মদিনার উল্টো দিকে 'সাওর' গুহায় আশ্রয় নিলেন।

- মাকড়সার জাল: কুরাইশরা খুঁজতে খুঁজতে গুহার মুখ পর্যন্ত চলে এসেছিল। কিন্তু আল্লাহর আদেশে গুহার মুখে মাকড়সা জাল বুনে দেয় এবং কবুতর বাসা বাঁধে। কাফেররা ভাবল, এখানে মানুষ থাকলে এই জাল আস্ত থাকত না। তারা ফিরে গেল।
- শান্তনা: আবু বকর (রা.) যখন ভয় পাচ্ছিলেন, নবীজি বললেন— "চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

---

৩. মদিনায় প্রবেশ: 'তাতলা আল বাদরু আলাইনা'

৮ই রবিউল আউয়াল নবীজি মদিনার উপকণ্ঠ কুবা-তে পৌঁছান। সেখানে তিনি ইসলামের প্রথম মসজিদ 'মসজিদে কুবা' নির্মাণ করেন। এরপর ১২ই রবিউল আউয়াল তিনি মদিনা শহরে প্রবেশ করেন।

- অভ্যর্থনা: মদিনার ছোট-বড় সবাই রাস্তায় নেমে এল। শিশুরা গান গাইতে লাগল— "তাতলা আল বাদরু আলাইনা..." (আমাদের ওপর পূর্ণিমা চাঁদ উদিত হয়েছে)।
- আবু আইয়ুব আনসারীর আতিথেয়তা: নবীজির উটনি যেখানে বসল, সেখানেই তিনি থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি ছিলেন হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)।

৪. মদিনা রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন (রাষ্ট্র পরিচালনা)

মদিনায় পৌঁছে নবীজি (সা.) কেবল ইবাদত নয়, একটি আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের কাজ শুরু করেন। এর প্রধান স্তম্ভগুলো ছিল:

- মসজিদে নববী নির্মাণ: এটি ছিল মদিনার শাসনকেন্দ্র, সংসদ ভবন এবং শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। নবীজি নিজে পাথর বহন করে এই মসজিদ নির্মাণে অংশ নেন।
- মুয়াখাত (ভ্রাতৃত্ব স্থাপন): মক্কা থেকে আসা রিক্তহস্ত মুহাজির এবং মদিনার সাহায্যকারী আনসারদের মধ্যে নবীজি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দিলেন। আনসাররা তাদের ঘরবাড়ি ও সম্পদের অর্ধেক মুহাজির ভাইদের দিয়ে দিলেন—যা ইতিহাসে ত্যাগের এক অনন্য উদাহরণ।
- মদিনা সনদ (Charter of Medina): এটি ছিল বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান। এতে মুসলিম, ইহুদি এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সমান অধিকার এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। এর মাধ্যমে মদিনা একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

৫. আজান প্রবর্তন ও নতুন সমাজ

মদিনায় হিজরতের পর নামাজের জন্য মানুষকে ডাকার প্রয়োজন দেখা দিল। নবীজি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ এবং হযরত উমরের (রা.) স্বপ্নে দেখা আজানের শব্দগুলো নবীজি অনুমোদন দিলেন। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হিসেবে নিগ্রো গোলাম হযরত বিলাল (রা.) তাঁর সুমধুর কণ্ঠে আজান দিলেন।

অধ্যায় ১০: সত্য-মিথ্যার ফয়সালা—বদর, ওহুদ ও খন্দক

ইসলামি ইতিহাসে এই যুদ্ধগুলো কেবল রাজ্য জয়ের জন্য ছিল না, বরং এগুলো ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম।

১. বদর যুদ্ধ: প্রথম প্রকাশ্য বিজয় (২ হিজরি)

বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এটিকে কুরআনে 'ইয়াওমুল ফুরকান' বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের দিন বলা হয়েছে।

- অসম লড়াই: মক্কার কাফেরদের সংখ্যা ছিল ১০০০, যাদের ছিল আধুনিক অস্ত্র ও অশ্বারোহী বাহিনী। বিপরীতে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। তাঁদের ছিল মাত্র ২টি ঘোড়া এবং ৭০টি উট।
- নবীজির দোয়া: যুদ্ধের আগের রাতে নবীজি (সা.) সিজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, "হে আল্লাহ! এই মুষ্টিমেয় দলটি যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায়, তবে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার মতো আর কেউ থাকবে না।"
- অলৌকিক সাহায্য: আল্লাহ তাআলা ৫০০০ ফেরেশতা পাঠিয়ে মুসলিমদের সাহায্য করেন। যুদ্ধে আবু জাহলসহ কুরাইশদের ৭০ জন নেতা নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দি হয়। মুসলিমদের মাত্র ১৪ জন শাহাদাত বরণ করেন। এই বিজয় ইসলামের ভিত্তি মজবুত করে দেয়।

২. ওহুদ যুদ্ধ: ধৈর্যের পরীক্ষা (৩ হিজরি)

বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে কুরাইশরা ৩০০০ সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণ করতে আসে। ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

- তিরন্দাজদের দায়িত্ব: নবীজি (সা.) ওহুদ পাহাড়ের একটি গিরিপথে ৫০ জন তিরন্দাজকে নিযুক্ত করেন এবং নির্দেশ দেন— "আমরা জয়ী হই বা পরাজিত, তোমরা এই জায়গা ছাড়বে না।"
- বিপর্যয় ও শিক্ষা: প্রাথমিক বিজয়ের পর মুসলিমদের একটি অংশ গণিমতের মাল সংগ্রহের জন্য পাহাড়ের চূড়া ছেড়ে নিচে নেমে আসে। এই সুযোগে কুরাইশ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (যিনি তখনো মুসলিম হননি) পেছন থেকে আক্রমণ করেন।
- নবীজির আঘাত প্রাপ্তি: এই যুদ্ধে নবীজি (সা.)-এর পবিত্র দন্ত মোবারক শহীদ হয় এবং গুজব রটে যায় যে তিনি নিহত হয়েছেন। তাঁর আপন চাচা হযরত হামজা (রা.) অত্যন্ত নৃশংসভাবে শহীদ হন। এই যুদ্ধ মুসলিমদের শিখিয়েছিল যে সেনাপতির আদেশ অমান্য করলে কত বড় মূল্য দিতে হয়।

---

৩. খন্দকের যুদ্ধ: পরিখা খনন ও বুদ্ধিমত্তা (৫ হিজরি)

এটিকে 'আহজাব' বা 'সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ' বলা হয়। আরবের সব পৌত্তলিক এবং ইহুদি গোত্র মিলে প্রায় ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে মদিনা ঘেরাও করে।

- পারস্যের কৌশল: হযরত সালমান ফারসি (রা.)-এর পরামর্শে নবীজি (সা.) মদিনার চারপাশে বিশাল পরিখা **(Trench)** খনন করার সিদ্ধান্ত নেন। আরবে এটি ছিল এক নতুন এবং অপরিচিত যুদ্ধ কৌশল।
- মহাসংকট: টানা এক মাস অবরোধের ফলে মদিনায় চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয়। নবীজি পেটে পাথর বেঁধে মাটি কাটার কাজ করেন। কুরাইশরা পরিখা পার হতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে।
- আল্লাহর সাহায্য: অবশেষে আল্লাহ তাআলা প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস এবং তুফান পাঠান। কাফেরদের তাঁবু উড়ে যায়, রান্নার হাঁড়ি উল্টে যায় এবং তারা ভয়ে মক্কা পালিয়ে যায়। বিনাযুদ্ধে ইসলাম জয়ী হয়।

---

৪. যুদ্ধগুলোর ঐতিহাসিক প্রভাব ও শিক্ষা

- বদর শিখিয়েছে— সংখ্যা নয়, আল্লাহর ওপর ঈমানই বিজয়ের মূল।
- ওহুদ শিখিয়েছে— নেতার আদেশ মানা এবং ধৈর্যের গুরুত্ব।
- খন্দক শিখিয়েছে— প্রয়োজনে নতুন টেকনোলজি বা কৌশল গ্রহণ করা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার শক্তি।

এই তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমেই আরবে ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কুরাইশরা বুঝতে পারে যে মুহাম্মদ (সা.)-কে থামানো অসম্ভব।

অধ্যায় ১১: হুদায়বিয়ার সন্ধি ও ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়

মদিনায় হিজরতের ছয় বছর পর নবীজি (সা.) স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি সাহাবীদের নিয়ে পবিত্র কাবা তাওয়াফ করছেন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষে তিনি ১৪০০ সাহাবীকে নিয়ে মক্কার পথে রওনা হলেন।

১. হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬ হিজরি): 'সুস্পষ্ট বিজয়'

মুসলিমরা যুদ্ধের পোশাকে নয়, বরং হজ্জের এহরাম বেঁধে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু কুরাইশরা তাদের মক্কায় ঢুকতে বাধা দিল। মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে উভয় পক্ষ আলোচনায় বসল।

- চুক্তির কঠিন শর্তাবলী: কুরাইশদের পক্ষ থেকে সুহাইল ইবনে আমর কিছু একতরফা শর্ত দিল। শর্তগুলো ছিল: ১. মুসলিমরা এ বছর হজ্জ না করেই ফিরে যাবে, আগামী বছর আসবে। ২. আগামী ১০ বছর কোনো যুদ্ধ হবে না। ৩. মক্কার কেউ মদিনায় পালিয়ে গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে, কিন্তু মদিনার কেউ মক্কায় এলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।
- সাহাবীদের ক্ষোভ ও নবীজির ধৈর্য: শর্তগুলো সাহাবীদের কাছে অপমানজনক মনে হয়েছিল। বিশেষ করে হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু নবীজি (সা.) সুদূরপ্রসারী চিন্তা করে এই সন্ধিতে রাজি হলেন।
- ফলাফল: আল্লাহ তাআলা কুরআনে এই সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে ঘোষণা করলেন। যুদ্ধের ভয় না থাকায় মানুষ দলে দলে ইসলাম সম্পর্কে জানতে শুরু করল এবং মাত্র দুই বছরে মুসলিমদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

---

২. মক্কা বিজয় (৮ হিজরি): রক্তপাতহীন বিপ্লব

কুরাইশরা হুদায়বিয়ার চুক্তির একটি শর্ত ভঙ্গ করলে নবীজি (সা.) ১০,০০০ সাহাবীর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে রওনা হলেন। এটি ছিল আরবের ইতিহাসে সবচেয়ে সুশৃঙ্খল অভিযান।

- আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ: মক্কার প্রধান নেতা আবু সুফিয়ান দেখলেন যে মুসলিমদের ঠেকানো অসম্ভব। তিনি নবীজির কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবীজি ঘোষণা করলেন— "যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ, যারা নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে তারা নিরাপদ।"
- বিনা যুদ্ধে জয়: নবীজি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তাঁর মাথা আল্লাহর শুকরিয়ায় উটের পিঠে নিচু হয়ে ছিল। কোনো রক্তপাত ছাড়াই মক্কা জয় হলো।
- মূর্তি অপসারণ: কাবা ঘরে প্রবেশ করে নবীজি (সা.) লাঠি দিয়ে ৩৬০টি মূর্তি ভেঙে ফেললেন এবং উচ্চারণ করলেন— "সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই বিষয়।" (সূরা বনী ইসরাইল: ৮১)।

---

৩. সাধারণ ক্ষমা ও মানবতার চরম নিদর্শন

মক্কা বিজয়ের পর কাবার সামনে মক্কার কুরাইশরা থরথর করে কাঁপছিল। এই সেই মানুষগুলো যারা নবীজিকে পাথর মেরেছিল, তাঁর সাহাবীদের হত্যা করেছিল এবং তাঁকে দেশছাড়া করেছিল। নবীজি তাদের জিজ্ঞেস করলেন— "হে কুরাইশরা! তোমরা আজ আমার কাছে কেমন ব্যবহার আশা করো?"

তারা বলল— "আমরা আপনার কাছে ভালো ব্যবহার আশা করি, কারণ আপনি একজন দয়ালু ভাই।" নবীজি তখন ইউসুফ (আ.)-এর সেই বিখ্যাত বাণী উচ্চারণ করলেন:

> **"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা সবাই মুক্ত!"**

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বিজয়ী আর দেখা যায়নি, যিনি চরম শত্রুদের হাতের নাগালে পেয়েও এক নিমিষে ক্ষমা করে দেন। এই মহানুভবতা দেখে মক্কার প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করে।

---

৪. এই অধ্যায়ের গুরুত্ব ও শিক্ষা

- হুদায়বিয়া আমাদের শেখায় যে সাময়িক পরাজয় মেনে নেওয়া অনেক সময় বড় বিজয়ের চাবিকাঠি হয়।
- মক্কা বিজয় প্রমাণ করে যে ইসলাম তরবারির জোরে নয়, বরং ক্ষমা এবং চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছে।
- এটি ছিল আরবে মূর্তিপূজার চূড়ান্ত অবসান এবং একত্ববাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

অধ্যায় ১২: বিদায় হজ্জ ও ইসলামের পূর্ণতা

মক্কা বিজয়ের দুই বছর পর আরবের প্রায় সব অঞ্চল থেকে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। ১০ম হিজরি সনে নবীজি (সা.) ঘোষণা দিলেন যে তিনি হজ্জ পালন করবেন। এই সংবাদ শুনে আরবের চারপাশ থেকে প্রায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার (মতান্তরে ১ লক্ষ ৪০ হাজার) সাহাবী মক্কায় সমবেত হন।

১. আরাফাতের ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ

৯ই জিলহজ্জ, জোহরের নামাজের পর নবীজি (সা.) উটের পিঠে চড়ে আরাফাতের ময়দানে লক্ষাধিক মানুষের সামনে এক অবিস্মরণীয় ভাষণ প্রদান করেন। এটি ছিল বিশ্ব মানবতার জন্য প্রথম মানবাধিকার সনদ।

ভাষণের প্রধান দিকসমূহ:

- **মানবাধিকার ও সাম্য:** নবীজি (সা.) ঘোষণা করলেন— *"হে লোকসকল! তোমাদের আল্লাহ এক, তোমাদের পিতাও (আদম) এক। আরবের ওপর কোনো অনারবের, কিংবা সাদার ওপর কালোর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো আল্লাহভীতি বা তাকওয়া।"*
- **নারীদের অধিকার:** তিনি জোর দিয়ে বললেন— *"তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তাদের ওপর যেমন তোমাদের অধিকার আছে, তোমাদের ওপরও তেমনি তাদের অধিকার রয়েছে।"*
- **রক্তপাত ও সুদের অবসান:** তিনি জাহেলিয়াত যুগের সকল রক্তের প্রতিশোধ এবং সুদের কারবার চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি নিজের বংশের সুদের দাবি (চাচা আব্বাসের সুদ) সবার আগে ক্ষমা করে দিয়ে আদর্শ স্থাপন করেন।
- **আমানত রক্ষা:** কারো কাছে কোনো আমানত থাকলে তা মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কঠোর নির্দেশ দেন।

---

২. ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা (আল-ইয়াওমা আকমালতু...)

আরাফাতের এই ভাষণের সময়ই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সেই ঐতিহাসিক আয়াতটি নাজিল করেন যা ইসলামের পূর্ণতা ঘোষণা করে:

> **"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ধর্মকে) পূর্ণ করলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"** (সূরা মায়িদা: ৩)

এই আয়াতটি শুনে হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদতে শুরু করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যেহেতু দায়িত্ব পূর্ণ হয়ে গেছে, তাই নবীজি (সা.)-এর বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

---

৩. উপস্থিতদের সাক্ষ্য গ্রহণ

ভাষণের শেষে নবীজি (সা.) আকাশের দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করলেন— *"হে লোকসকল! আমি কি আল্লাহর বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি?"* বিশাল জনসমুদ্র একস্বরে গর্জে উঠল— *"হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন।"* তখন নবীজি বললেন— *"হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।"* এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন— *"যারা আজ এখানে উপস্থিত আছো, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই কথাগুলো পৌঁছে দেয়।"*

---

৪. হজ্জ পরবর্তী মদিনায় প্রত্যাবর্তন

হজ্জ শেষে নবীজি (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন তাঁর দুনিয়াবি সফরের সময় ফুরিয়ে আসছে। তিনি প্রায়ই জান্নাতুল বাকিতে (মদিনার কবরস্থান) যেতেন এবং শহীদদের জন্য দোয়া করতেন। তিনি সাহাবীদের বারংবার কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার তাগিদ দিতেন যেন তাঁর অবর্তমানে তারা পথভ্রষ্ট না হয়।

---

৫. এই অধ্যায়ের শিক্ষা ও গুরুত্ব

- পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান: বিদায় হজ্জ প্রমাণ করে যে ইসলাম কেবল কিছু ইবাদতের নাম নয়, এটি সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ গাইড।
- অসাম্প্রদায়িকতা: বর্ণবাদ ও আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে উঠে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব যে কেবল চরিত্রের ওপর নির্ভর করে, তা নবীজি এই সফরেই শিখিয়ে গেছেন।
- দাওয়াতের দায়িত্ব: প্রতিটি মুসলিম যে ইসলামের একজন প্রচারক, সেই গুরুদায়িত্ব তিনি উম্মতের কাঁধে দিয়ে গেছেন।

অধ্যায় ১৩: নবীজি (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবন, খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক

মহানবী (সা.)-এর জীবন ছিল মূর্তমান কুরআন। তাঁর প্রতিটি কাজ ছিল পরিমিত, মার্জিত এবং অর্থবহ।

১. সাধারণ জীবনযাপন ও ঘরবাড়ি

মদিনার শাসক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ঘরবাড়ি ছিল অত্যন্ত সাধারণ। তাঁর বসবাসের ঘরগুলো ছিল মাটির তৈরি এবং খেজুর পাতা ও পশুর চামড়া দিয়ে ছাওয়া।

- বিছানা: তিনি খেজুর পাতার তৈরি চাটাই অথবা পশুর চামড়ার ভেতরে খেজুরের আঁশ ভরা গদিতে ঘুমাতেন। অনেক সময় সকালে তাঁর পিঠে চাটাইয়ের দাগ লেগে থাকত। সাহাবীরা ব্যথিত হয়ে নরম বিছানার কথা বললে তিনি বলতেন— "দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক তো একজন পথিকের মতো, যে দীর্ঘ সফরের মাঝে গাছের ছায়ায় ক্ষণিকের বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলা শুরু করে।"
- পরিবারের সাথে ব্যবহার: তিনি বাড়িতে অবস্থানকালে ঘরের কাজে বিবিদের সাহায্য করতেন। নিজের জুতো নিজে সেলাই করতেন এবং কাপড়ে তালি দিতেন। তিনি বলেছেন— "তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, যে তার পরিবারের কাছে শ্রেষ্ঠ।"

---

২. খাদ্যাভ্যাস ও পরিমিতি

নবীজি (সা.) কখনো পেট ভরে খাবার খেতেন না। অনেক সময় তাঁর উনুনে টানা দুই মাস আগুন জ্বলত না, শুধু খেজুর আর পানি খেয়ে দিন পার করতেন।

- প্রিয় খাবার: তিনি খেজুর, দুধ, মধু এবং লাউ খুব পছন্দ করতেন। ছাগলের সামনের পায়ের মাংস তাঁর প্রিয় ছিল। এছাড়া 'সারীদ' (ঝোল ও রুটির মিশ্রণ) তাঁর পছন্দের খাবার ছিল।

- **খাবার আদব:** তিনি সবসময় ডান হাতে খাবার খেতেন এবং সামনে থেকে খেতেন। কখনো খাবারের কোনো দোষ ধরতেন না; ভালো লাগলে খেতেন, না লাগলে চুপ থাকতেন।
- **সংযম:** তিনি বলতেন— "মানুষের জন্য কয়েক লোকমা খাবারই যথেষ্ট যা তার পিঠ সোজা রাখতে পারে।" তিনি পানির পাত্রে নিশ্বাস ফেলা পছন্দ করতেন না এবং তিন চুমুকে পানি পান করতেন।

---

৩. পোশাক ও সাজসজ্জা

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন অত্যন্ত রুচিশীল এবং পরিচ্ছন্ন। তিনি বিলাসিতা পছন্দ করতেন না, কিন্তু অপরিচ্ছন্নতাকেও ঘৃণা করতেন।

- **লেবাস:** তাঁর প্রিয় পোশাক ছিল 'কামিস' বা জামা। তিনি চাদর এবং লুঙ্গিও পরতেন। সাধারণত সুতি কাপড়ের পোশাক পরতেন। যুদ্ধের সময় লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করতেন।
- **রঙ:** তিনি সাদা পোশাক সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন এবং বলতেন— "তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো এবং তোমাদের মৃতদের সাদা কাপড় দিয়ে কাফন দাও।" অনেক সময় তিনি সবুজ বা কালো চাদরও ব্যবহার করেছেন।
- **পাগড়ি ও আংটি:** তিনি মাথায় বড় পাগড়ি (আমামা) বাঁধতেন। তাঁর একটি রুপার আংটি ছিল যার ওপর **'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ'** খোদাই করা ছিল, যা তিনি সীলমোহর হিসেবে ব্যবহার করতেন।
- **সুগন্ধি:** তিনি সুগন্ধি বা আতর খুব ভালোবাসতেন। কস্তুরী বা মেস্ক তাঁর প্রিয় ছিল। তিনি বলতেন— "দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমার প্রিয়— নারী *(সম্মান ও যত্ন)*, সুগন্ধি এবং নামাজের শীতলতা।"

---

৪. কথা বলা ও হাসি

নবীজি (সা.)-এর কথা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং মধুর। তিনি কখনোই অনর্থক কথা বলতেন না।

- **বাকচাতুর্য:** তিনি যখন কথা বলতেন, শ্রোতারা তা সহজেই মুখস্থ করতে পারত। প্রয়োজনে তিনি একই কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যেন সবাই বুঝতে পারে।
- **হাস্যোজ্জ্বল মুখ:** তিনি কারো সাথে কর্কশ স্বরে কথা বলতেন না। তাঁর রাগের চেয়ে হাসি বেশি ছিল। তবে তিনি কখনো উচ্চস্বরে অট্টহাসি দিতেন না, শুধু মৃদু হাসতেন (তাবাসসুম)।

---

৫. ঘুমানোর ও ইবাদতের রুটিন

তিনি এশার নামাজের পর দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তেন এবং শেষ রাতে (তাহাজ্জুদ) ইবাদতের জন্য উঠতেন। তিনি ডান কাতে কিবলামুখী হয়ে শুতেন এবং হাতের তালু গালের নিচে রাখতেন। ইবাদতে তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত।

এই অধ্যায়ের শিক্ষা

নবীজি (সা.)-এর জীবন আমাদের শেখায় যে— সুখ দামি খাবারে বা অট্টালিকায় নয়, বরং অল্পে তুষ্টি এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে নিহিত। তিনি চাইলে স্বর্ণের প্রাসাদে থাকতে পারতেন, কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছেন দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের জীবন, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আসা প্রতিটি সাধারণ মানুষ তাঁকে নিজের জন্য আদর্শ হিসেবে পায়।

অধ্যায় ১৪: নবীজি (সা.)-এর মুজিজা বা অলৌকিক ক্ষমতা

'মুজিজা' হলো এমন এক অলৌকিক ঘটনা যা মানুষের সাধ্যের বাইরে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের হাত দিয়ে প্রকাশিত হয়। নবীজি (সা.)-এর অসংখ্য মুজিজার মধ্যে প্রধান কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হলো:

১. শ্রেষ্ঠ মুজিজা: পবিত্র কুরআন

নবীজি (সা.)-এর সবচেয়ে বড় এবং শাশ্বত মুজিজা হলো পবিত্র কুরআন। এটি একটি ভাষাতাত্ত্বিক অলৌকিকতা। আরবের সেরা কবি ও সাহিত্যিকরা যেখানে কুরআনের একটি ছোট আয়াতের মতো কিছু তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানেই এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। অন্যান্য নবীদের মুজিজা তাঁদের মৃত্যুর সাথে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু কুরআন আজও অবিকৃত এবং এর প্রভাব চিরস্থায়ী।

২. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ (শাক্কুল ক্বামার)

মক্কার কাফেররা একবার নবীজিকে চ্যালেঞ্জ করল যে— "তুমি যদি সত্য নবী হও তবে আকাশের চাঁদকে দুই ভাগ করে দেখাও।" নবীজি আল্লাহর ইশারায় আঙুল তুলে চাঁদের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

- অলৌকিক দৃশ্য: উপস্থিত সবাই দেখল যে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুই দিকে সরে গেল এবং মাঝখানে হেরা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল।
- প্রতিক্রিয়া: কাফেররা একে 'জাদু' বলে উড়িয়ে দিলেও ঐতিহাসিক সূত্রে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই দৃশ্য দেখার প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

৩. আঙুলের মাঝখান থেকে পানির ঝরনা

মদিনার জীবনে এবং যুদ্ধের ময়দানে সাহাবীরা যখন পানির চরম সংকটে পড়তেন, তখন নবীজি অলৌকিক সমাধান দিতেন।

- সালেহ ও হুদায়বিয়ার ঘটনা: সাহাবীরা যখন একটি পাত্রে সামান্য পানি নিয়ে এলেন, নবীজি সেই পাত্রে হাত রাখলেন। সাথে সাথে তাঁর আঙুলের মাঝখান থেকে ঝরনার মতো পানি প্রবাহিত হতে শুরু করল। শত শত সাহাবী সেই পানি দিয়ে অজু করলেন এবং তৃপ্তিসহকারে পান করলেন।

৪. যৎসামান্য খাবারে কয়েক হাজার মানুষের তৃপ্তি

খন্দকের যুদ্ধের সময় মদিনায় চরম দুর্ভিক্ষ চলছিল। হযরত জাবের (রা.) মাত্র একটি ছাগল জবাই করে এবং আড়াই কেজি আটা দিয়ে নবীজির জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন।

- **বিস্ময়কর বরকত:** নবীজি সেই খাদ্যে বরকতের দোয়া করলেন এবং প্রায় এক হাজার সাহাবীকে সেই খাবার থেকে খাওয়ালেন। সবাই পেট ভরে খাওয়ার পরও দেখা গেল পাতিল ভর্তি তরকারি এবং আটার খামির যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে।

---

৫. গাছের কান্না ও জড় পদার্থের সাক্ষ্য

- **খেজুর গাছের কান্না:** মসজিদে নববীতে নবীজি একটি শুকনো খেজুর গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। পরবর্তীতে যখন মিম্বর তৈরি করা হলো, তখন নবীজি সেই গুঁড়ি ছেড়ে মিম্বরে দাঁড়ালে গুঁড়িটি থেকে ছোট বাচ্চার মতো কান্নার আওয়াজ আসতে লাগল। নবীজি নেমে গিয়ে সেটিকে জড়িয়ে ধরলে কান্না থামে।
- **পাথরের সালাম:** নবীজি বলেছেন— "আমি মক্কার সেই পাথরকে চিনি যেটি নবুয়ত পাওয়ার আগে আমাকে সালাম দিত।"

৬. ভবিষ্যতের সংবাদ ও মুজিজা

নবীজি (সা.) ওহীর মাধ্যমে ভবিষ্যতের এমন অনেক সংবাদ দিয়েছিলেন যা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। যেমন:

- কিসরা ও কায়সারের (পারস্য ও রোম) সাম্রাজ্য বিজয়।
- হযরত ফাতেমা (রা.)-এর প্রথম ইন্তেকাল এবং হযরত হাসান (রা.)-এর মাধ্যমে মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে সন্ধি হওয়া।
- কিয়ামতের আলামতসমূহ যা আমরা বর্তমান যুগে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

অধ্যায় ১৫: ওফাত ও উম্মতের প্রতি শেষ বার্তা

বিদায় হজ্ব থেকে ফেরার পর নবীজি (সা.)-এর শারীরিক অবস্থার ধীরে ধীরে অবনতি হতে থাকে। ১১ হিজরি সনের সফর মাসের শেষ দিকে তিনি তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হন।

১. অসুস্থতার দিনগুলো

অসুস্থতা সত্ত্বেও নবীজি (সা.) যতদিন সম্ভব হয়েছে মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ পড়িয়েছেন। যখন তিনি একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়লেন, তখন তিনি হযরত আবু বকর **(রা.)**-কে ইমামতি করার নির্দেশ দেন। এটি ছিল ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের একটি সংকেত।

- **শেষ দান:** ইন্তেকালের কয়েকদিন আগে তাঁর কাছে গচ্ছিত শেষ সাতটি দিনার তিনি দান করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বললেন, "মুহাম্মদ কীভাবে আল্লাহর সাথে দেখা করবে যদি তার ঘরে এই অর্থ অবশিষ্ট থাকে?"

২. উম্মতের প্রতি শেষ নির্দেশসমূহ

অসুস্থ অবস্থায়ও নবীজি (সা.) তাঁর উম্মতের কথা ভুলে যাননি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মুখে দুটি কথা বারবার উচ্চারিত হচ্ছিল:

1. **"আস-সালাহ, আস-সালাহ"** (নামাজ, নামাজ)— অর্থাৎ নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হও।
2. **"দাস-দাসীদের প্রতি সদয় হওয়া"**— অর্থাৎ সমাজের দুর্বল ও অধীনস্থ মানুষের অধিকার রক্ষা করো।

তিনি আরও বলেছিলেন, *"আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যতক্ষণ তোমরা এ দুটি আঁকড়ে ধরবে, ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না— আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং আমার সুন্নাহ।"*

---

৩. জীবনের অন্তিম মুহূর্ত (১১ হিজরি, ১২ই রবিউল আউয়াল)

সোমবার দুপুর বেলা। নবীজি (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর কোলে মাথা রেখে শায়িত ছিলেন। পাশে একটি পানির পাত্র ছিল, তিনি বারবার হাত ভিজিয়ে মুখ মুছছিলেন এবং বলছিলেন— *"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নিশ্চয়ই মৃত্যুর বড় যন্ত্রণা আছে।"*

- **পবিত্র ওফাত:** জিবরাঈল (আ.) মালাকুল মউতকে নিয়ে দরজায় অনুমতি চাইলেন। নবীজি জান্নাতের উচ্চাসনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর জীবনের শেষ বাক্য ছিল— **"বালির রফীকিল আ'লা"** (বরং আমি মহান বন্ধুর—আল্লাহর—সাথী হতে চাই)। এরপর তাঁর হাতটি নুইয়ে পড়ল এবং তিনি মহান রবের সান্নিধ্যে চলে গেলেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

৪. সাহাবীদের শোক ও হযরত আবু বকর (রা.)

নবীজির ওফাতের খবর মদিনায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। সাহাবীরা শোকে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। হযরত উমর (রা.) এতটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি তলোয়ার উঁচিয়ে বললেন— *"যে বলবে নবীজি মারা গেছেন, আমি তার মাথা কেটে ফেলব।"*

এমন সংকটময় মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা.) ধীরস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে সেই ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন যা মুসলিম উম্মাহর ঈমান রক্ষা করেছিল। তিনি বললেন:

> **"হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদের ইবাদত করতে, তারা জেনে রাখো মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতে, তারা জেনে রাখো আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।"**

এরপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন: *"মুহাম্মদ তো একজন রাসূল মাত্র, তাঁর আগে আরও অনেক রাসূল গত হয়েছেন..."* (সূরা আল-ইমরান: ১৪৪)। সাহাবীরা শান্ত হলেন এবং বাস্তবতাকে মেনে নিলেন।

---

৫. দাফন ও উত্তরাধিকার

হযরত আবু বকর (রা.)-এর বর্ণনামতে নবীজি বলেছিলেন— *"নবী যেখানে ইন্তেকাল করেন, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।"* ফলে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরা শরীফেই (যেখানে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন) তাঁর রওজা মোবারক তৈরি করা হয়।

নবীজি (সা.) কোনো দিরহাম বা দিনার রেখে যাননি। তাঁর উত্তরাধিকার ছিল তাঁর জীবনদর্শন, তাঁর সুন্নাহ এবং একটি সুশৃঙ্খল উম্মাহ।

উপসংহার

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র সীরাত বা জীবনচরিত আলোচনা কোনো সাধারণ ইতিহাস পাঠ নয়; বরং এটি মানবাত্মার পরিশুদ্ধি এবং একটি আদর্শ সমাজ গঠনের পূর্ণাঙ্গ নীল নকশা। আমরা এই গ্রন্থের ১৫টি অধ্যায়ে আরবের সেই তপ্ত মরুভূমি থেকে শুরু করে মদিনার হিজরত এবং ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছি, তার প্রতিটি মোড়ে আমাদের জন্য রয়েছে অমূল্য শিক্ষা।

আজকের এই আধুনিক পৃথিবীতে, যেখানে মানুষ প্রযুক্তিতে চরম শিখরে পৌঁছেছে, কিন্তু নৈতিকতা ও মানসিক শান্তিতে চরম সংকটে নিমজ্জিত; সেখানে নবীজি (সা.)-এর আদর্শ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা দেখেছি কীভাবে তিনি আরবের চরম বর্বর ও বিবাদমান গোত্রগুলোকে একটি সুশৃঙ্খল ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। যে সমাজে কন্যাসন্তানকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হতো, সেখানে তিনি নারীর অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মায়ের পায়ের নিচে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

শান্তি ও ক্ষমার মহিমা: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো ধৈর্য এবং ক্ষমা। মক্কার তেরোটি বছর তিনি যে অবর্ণনীয় জুলুম সহ্য করেছেন এবং পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের দিন যেভাবে তাঁর জাতশত্রুদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন যে, বিজয় মানেই প্রতিশোধ নয়, বরং বিজয় মানে হলো মানুষের হৃদয় জয় করা। আজকের যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে নবীজির এই 'সাধারণ ক্ষমা' ও 'মানবিকতা'র নীতি অনুসরণ করলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

নেতৃত্ব ও ইনসাফ: মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি দেখিয়ে গেছেন যে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করাই হলো প্রকৃত সুশাসন। তাঁর প্রণীত 'মদিনা সনদ' আজও বিশ্বের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে এক বিস্ময়। তিনি কেবল মুসলিমদের নেতা ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন প্রতিটি মজলুম ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের আশ্রয়স্থল। তাঁর ইনসাফ এতটাই কঠোর ছিল যে, তিনি নিজের প্রিয় কন্যা ফাতেমার ক্ষেত্রেও আইনের ঊর্ধ্বে কাউকে স্থান দেননি।

ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব: নবীজি (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবন আমাদের শেখায় যে, আড়ম্বরহীন সাধারণ জীবনযাপনের মধ্যেও মহান হওয়া যায়। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানব হয়েও নিজের কাজ নিজে করতেন, ছেঁড়া কাপড়ে তালি দিতেন এবং ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বাঁধতেন। তাঁর এই ত্যাগ আমাদের ভোগবাদী সমাজের বিপরীতে ত্যাগের মহিমা শেখায়।

শেষ কথা: পরিশেষে বলতে চাই, ‘মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)’ গ্রন্থটি কেবল পাঠ করার জন্য নয়, বরং ধারণ করার জন্য। আমরা যদি কেবল বইয়ের পাতায় সীরাতকে সীমাবদ্ধ রাখি এবং আমাদের কাজ, আচরণ ও লেনদেনে নবীজির আদর্শকে প্রতিফলন না করি, তবে আমাদের এই পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মহানবী (সা.)-এর মিশন ছিল মানুষের মধ্যে আল্লাহর পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং মানুষকে মানুষের দাসে পরিণত করার পরিবর্তে এক আল্লাহর গোলামে পরিণত করা।

বিদায় হজ্জের সেই ঐতিহাসিক দিনে তিনি আমাদের কাঁধে যে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন—অর্থাৎ সত্যের বাণীকে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া—সেই দায়িত্ব পালনে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের চরিত্র হতে হবে নবীজির চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। তাঁর দেখানো পথে হাঁটলেই কেবল বর্তমান বিশ্বের অস্থিরতা, হানাহানি এবং ঘৃণা দূর হয়ে একটি প্রেমময় ও শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং আমাদের জীবনকে প্রিয়নবী (সা.)-এর সুন্নাহর নূরে আলোকিত করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ আমাদের তাঁরই নির্দেশিত পথে পরিচালিত করুন এবং পরকালে তাঁর প্রিয় হাবিবের সাথে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য নসিব করুন। আমিন।

সমাপ্ত